Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 117 – 122
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

ত্রিকোণ প্রেম, নিরাপত্তা ও যৌনতার অন্যধারা : তারাশঙ্করের চারটি গল্প

বিপ্লব ব্যানার্জ্জী
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : biplabbanerjee17091993@gmail.com

Keyword
প্রবৃত্তি, মনস্তাত্বিক, হিংসা, ফুকো, লোভ, যৌনতা, আত্মকেন্দ্রিক, কলঙ্ক।

Abstract
বাংলা কথাসাহিত্যে অধিকাংশ রবীন্দ্র উত্তর-সাধকগণ সমাজের উচ্চমঞ্চের সংকীর্ণ বাতাবয়ন থেকে নেমে এসেছেন একেবারে মাটির বুকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রবৃত্তি নির্ভর, যদিও তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই রয়েছে প্রবৃত্তির ছায়া, তবুও 'তারিণী মাঝি, 'নারী ও নাগিনী', 'অগ্রদানি' এবং 'বেদেণী'–এই চারটি গল্প অলোচনা করলে দেখা যায় প্রবৃত্তি এখানে চরম সীমা পার করে গেছে। মানুষের মধ্যে থাকা মানবতা, মনুষ্যত্ব এবং শুভ চিন্তাভাবনা গুলিকে লোভ, ক্ষমতা, হিংসা, জীবনতৃষ্ণা কীভাবে গ্রাস করছে তা উক্ত গল্প গুলিকে বিশ্লেষন করলে বোঝা যায়। এখানে মানুষ যেন প্রবৃত্তির দাস, আর এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। যে তারিণী অবলীলায় মানুষের প্রাণ বাঁচায় সে কেনো নিজের প্রেমকে হত্যা করলো? 'অগ্রদানী' গল্পের মূখ্য চরিত্র পূর্ণ চক্রবর্তী, কেন নিজের ছেলের মৃত্যুর পিন্ড খেলো? 'বেদিনী' গল্পের নায়িকা, কেন ধারাবাহিক ভাবে জীবনসঙ্গী পরিবর্তন করে চলল? 'নারী ও নাগিনী' গল্পে নাগিনী রূপ নারী কেন হত্যা করলো তাঁর সতীনকে? এই প্রশ্ন গুলি, মিশেল ফুকো এবং লোক চিন্তাভাবনার বিষয়টিকে টোটেম, ট্যাবু এবং নারী মনস্তত্ব ইত্যাদির আলোকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি মূল প্রবন্ধে।

Discussion
বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চাকরি, ব্যবসা বা জমিদারি দেখাশোনার কাজে যুক্ত থাকলেও পরবর্তী জীবনটাকে সম্পূর্ণ ভাবেই সাহিত্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তারাশঙ্করকে 'শৈলজানন্দের সহযাত্রী' বলে আখ্যায়িত করেছেন ড. সুকুমার সেন। শৈলজানন্দ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প পাঠ করে তারাশঙ্কর যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন –

"...ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্ত-মাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা-তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতছে, কোথাও হারছে।"[১]

আর এখান থেকেই তাঁর সাহিত্যে পথ চলার একটি অন্য মাত্রা এনে দেয়। শৈলজানন্দ যেমন ভাবে কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবনের সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনি নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলেন, ঠিক তেমনি তারাশঙ্কর দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ মানুষের জনজীবন অর্থাৎ জমিদার ঘর থেকে মালোদের পাড়া পর্যন্ত তিনি বিচরণ করে বেড়িয়েছেন। তাঁর এই ভিন্ন জীবনদর্শনের জন্যই সাহিত্য অনুরাগী পাঠকরা পেয়ে গেল একেবারে নিছক রক্ত-মাংসে গড়া সজীব মানুষদের কথা। যদিও তারাশঙ্করের কমবেশি প্রায় প্রতিটি গল্পেই রয়েছে প্রবৃত্তির ছায়া, তবুও বলা যায় 'তারিণী মাঝি, 'নারী ও নাগিনী', 'অগ্রদানী' এবং 'বেদেনী' এই চারটি গল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের অস্তিত্ব প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে গেছে ।

প্রথমত যদি 'তারিণী মাঝি' এবং 'নারী ও নাগিনী' গল্পদ্বয়কে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'তারিনী মাঝি' গল্পে মূল চরিত্র সংখ্যা তিনটি– তারিণী, সুখী এবং ময়ূরাক্ষী নদী। আপাত দৃষ্টিতে ময়ূরাক্ষীকে চরিত্র মানতে দ্বিধাবোধ হলেও লেখক কিন্তু গল্পের উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষীকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তারিণীর জীবন ও জীবিকা যদি তলিয়ে দেখি, তাহলে দেখা যায় দাম্পত্যজীবনের সাথে জড়িত তার স্ত্রী সুখী এবং জীবিকার সঙ্গে জড়িত প্রিয় ময়ূরাক্ষী। এই দুই নারীর উপর নির্ভর করে তারিণীর জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। তাই তারিণী অকপটে স্বীকার করে –

"পেটের ভাত ঐ ময়ূরাক্ষীর দৌলতে।"[২]

এবং সুখীর সম্পর্কে বলে-

"সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি হয় ভাই।"[৩]

এখান থেকেই একটি ত্রিকোন প্রেমের আভাসও পাওয়া যায়। বর্ষার সময় ময়ূরাক্ষীর রূপ অন্যের কাছে 'রাক্ষসী' বা 'ভয়ঙ্করী' হলেও তারিণীর কাছে তা বড় প্রিয় হয়ে ওঠে। সেই সময়েই তার রোজগারের সময়, ময়ূরাক্ষীও বিভিন্ন সময় তাকে নানাবিধ উপহার দিয়ে থাকে। যেমন ঘোষদের গৃহবধূ যখন নদীর জলে ডুবে প্রায় মরনাপন্ন ঠিক সেই সময় তারিনী ত্রাতার ভূমিকা পালন করে সেই নববধূকে বাঁচায়। উপহার হিসেবে ঘোষবাবু তারিণীর যা-চায় তা চেয়ে নিতে বললে, প্রথমে সে নিজ স্বভাববসত এক হাঁড়ি মদের দাম আটআনা এবং পরক্ষণেই সুখীর কথা মনে পড়ায় তার জন্য ফাঁদি লত এবং চাদরের পতিবর্তে শাড়ি চেয়ে নেয়। প্রত্যক্ষ ভাবে এখানে ঘোষবাবু উপহার দিলেও পরক্ষে এই দান ময়ূরাক্ষীর। এখানে একটা বিষয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, ময়ূরাক্ষী হয়তো তারিণীকে কিছু দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারিণী নিজের জন্য না নিয়ে সুখীর জন্য ভেবেছে। স্পষ্টতই প্রশ্ন জাগে, এখান থেকেই কি তাহলে ময়ূরাক্ষীর হিংসা শুরু সুখীর উপর? অপরদিকে এসব ঘটনার পর সুখীও নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না, তাই বলে বসে–

"কোন দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দেবো কিন্তু।"[৪]

আর তারিণীর উপর ময়ূরাক্ষীর ভালোবাসার ইঙ্গিতও বিভিন্ন সংলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। নদীর ভয়াবহ রূপ বন্যাকে সবাই ভয় করলেও তারিণী ভয় করে না, কারণ ময়ূরাক্ষী সকলের ক্ষতি সাধন করলেও তারিণীর কোনো ক্ষতি করবে না, এমন বিশ্বাসও তারিণীর জন্মেছিল। জলের মধ্যে থাকলেও তারিণীর শরীর খারাপ হয় না, তাই সে বলে;

"আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলে।"[৫]

এভাবে নানা টুকরো টুকরো সংলাপের মাধ্যমে নর-নারীর বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকেও কথাকার তুলে ধরেছেন। আবার দেশে যখন চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন সকলে দেশ ছাড়লেও তারিণী কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে যেতে পারে নি, হয়তো বা ময়ূরাক্ষীর টান অনুভব করেই আবার সে দেশে ফিরে এসেছে। এভাবেই ত্রিকোন প্রেমের এক অনবদ্য কাহিনি 'তারিণী মাঝি' গল্পে পাওয়া যায়।

অনুরূপ ভাবে এক অদ্ভুত ত্রিকোন প্রেমের কথা পাওয়া যায় 'নারী ও নাগিনী' গল্পে। যেখানে নায়ক খোঁড়া শেখের বীভৎস চেহারার বর্ণনা দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। তার এক পা খোঁড়া, কুৎসিত ব্যাধিতে তাঁর নাক বসে গিয়ে শুধু বীভৎস গহ্বরটি দেখা যায়। শুধু তাই নয় লেখকের কথায় –

"বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।"[৬]

এরূপ চেহারা নিয়ে একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারী জোবেদার সঙ্গে তার বিবাহটাই বা কেমন করে হলো, সে প্রশ্ন প্রথমেই জাগে। আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়তো নাগিনীর প্রবেশ এই গল্পে। জোবেদার প্রতি যে খোঁড়া সম্পূর্ণরূপে উদাসীন তা গল্পটির উপর মনোনিবেশ করলেই বোঝা যায়। স্ত্রীর পরণে একজোড়া নতুন কাপড় দিতে অপারক হলেও নিজের নেশার জোগান সে ঠিকই করে নিতে পারে। এই ভয়ঙ্কর রূপের চেহারা এবং দায়বদ্ধহীন মানুষের সাথে একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারী যে খুব ভাল ভাবে সংসার করেতে পারে না তারই পরিচয় বহন করে তাদের সন্তানহীনতা। আর এদেরই সম্পর্কের ফাটল দিয়ে ঢুকে পড়ছে গল্পের তৃতীয় চরিত্র 'উদয়নাগ' নামক সর্পিনীটি। উদয়নাগের সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে খোঁড়া তাকে মিনি পরিয়েছে, ঠোঁটে চুম্বন করেছে এমনকি তাকে সিঁদুর পরিয়ে 'বিবি' সম্বোধন করেছে। শুধু তাই নয় হাতে জড়িয়ে ধরে এক যৌন আস্বাদনও খোঁড়া তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করেছে। আর এখানেই ত্রিকোণ প্রেমের মধ্যে থাকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমলিঙ্গের প্রতি পারস্পারিক হিংসা, তা জোবেদার কথাতেই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে –

"এতো সাপ মরে ওটা মরে নাতো।"[৭]

আর এমন কথা জোবেদার মানসকক্ষে প্রবেশ করবেই না কেন? যখন সর্পিনীদের মিলনের সময় হয় তখন খোঁড়া উদয়নাগকে দূরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলেও সে আবার ফিরে আসে হয়তো বা খোঁড়ার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে বাধ সাধলো জোবেদা। ঘুটে দিয়ে তাকে আহত করে তাড়িয়ে দিয়ে, হতে দেয় নি খোঁড়ার সাথে নাগিণীর মিলন।

এই পর্যায়ে এসে দুটো গল্প যেন এক অদ্ভুত ভাবে মিলে যায়, একদিকে 'তারিণী মাঝি' গল্পে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে তারিনীর সম্পর্কের বাধা হয়ে দাড়িয়ে ছিল সুখী। তাই সুখীকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই হয়তো ময়ূরাক্ষী প্রবল আকার ধারণ করে এবং প্রচণ্ড গর্জনে নিজের কবলে আনার চেষ্টা করে সুখীকে। শেষ পর্যন্ত ময়ূরাক্ষীর গূঢ় অভিসন্ধিই পূর্ণতা পায়। তারিনী নিজের হাতে নিজের ভালোবাসাকে হত্যা করে। অপর গল্পে খোঁড়া এবং উদয়নাগের মধ্যকার বাধা জোবেদাকে উদয়নাগ দংশন করে হত্যা করে, খোঁড়াকে চিরতরে পাওয়ার জন্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ে 'অগ্রদানী' এবং 'বেদেনী' এই দুই গল্প বিশ্লেষণ করে এক অন্য মাত্রায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রথমত 'অগ্রদানী' গল্পের নামকরণের সূত্রটি শুরুতেই একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। হিন্দুদের পরলৌকিক ক্রিয়াকর্মের অন্যতম একটি নিয়ম হলো মৃত ব্যাক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে পিন্ড দান। শ্রাদ্ধের সময় কোনো এক ব্রাহ্মণ সে পিন্ড খেয়ে থাকেন, এই কাজটি যে ব্রাহ্মণ করে থাকেন তাকে 'অগ্রদানী' বলা হয়ে থাকে। এই সব ব্রাহ্মণরা সমাজে পতিত হয়ে থাকে, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একসারিতে বসবার অধিকার এরা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। অতএব সামাজিক অবস্থানের এইরকম জটিলতার কারণে স্বেচ্ছায় কোনো অন্য ব্রাহ্মণ অগ্রদানী হতে চাইবেন না, একথা সহজেই অনুমেয়। একবার অগ্রদানী হয়ে গেলে আর জাতে ওঠার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তবুও গল্পে পূর্ণ চক্রবর্তী কেন অগ্রদানী হয়ে দান গ্রহন করেছিল, সেই বিশ্লেষণেই আলোচনার মূল বক্তব্য। গল্পে প্রথম দিকে পূর্ণ চক্রবর্তীকে দেখানো হয়েছে একজন লোভী ব্রাহ্মণ হিসাবে, তাই গল্পটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে বিশ্লেষণ করলে সুবিধে হয়। প্রথম পর্যায়ে দরিদ্র, অলস ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর লালসা বৃত্তিকে প্রকট করা হয়েছে। যে কিনা ভোজের আগেই খাবারের উদ্দেশ্যে চলে আসে, অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবার গলাদ্ধকরণ করে। আবার ছাঁদা হিসাবে খাবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে খাবার সন্তানদের মুখে তুলে না দিয়ে রাত্রে চুরি করে নিজে খেয়ে নেয়। এমন চরিত্রকে লোভী, অমানবিক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। একদিকে দারিদ্রতা ও সংসার এবং অন্যদিকে লোলুপতা ও অমানবিকতার বৈশিষ্ট্যে তাকে এক অদ্ভুত পরীক্ষায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখার বিষয় হল শুধুমাত্র কি লোভেরই বশবর্তী হয়েই পূর্ণ চক্রবর্তী গোটা জীবন কাটিয়েছে নাকি তার মধ্যে আরও কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল? এর বিশ্লেষণেই হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল বিষয়। শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী

শিবরাণী সন্তান সম্ভবা, পূর্বে পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে, তাই এবার যাতে আর কোন অঘটন না ঘটে সেদিকে নজর রেখে তারা এবারে আর কোনো ফাঁক ফোকর রাখে নি। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সূতিকা গৃহের দুয়ারের সম্মুখে ব্রাহ্মণ রাখলে তা শুভ। তাই শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছে যাতে পূর্ণ চক্রবর্তী তার আঁতুড়ঘরের দুয়ারে থাকে। পূন্যের কল্যানে যদি তাদের মনোবাসনা সিদ্ধ হয় তবে শ্যামাদাস বাবু পূর্ণকে দশ বিঘে জমি আর আজীবন সিংহবাহিনী প্রসাদ দেবে বলে অঙ্গীকার করে। এদিকে আবার পূর্ণর স্ত্রীও সন্তান সম্ভবা তবুও নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে সে শ্যামাদাস বাবুর বাড়ি যায়, তাকি শুধু নিজের আখের গোছাতে নাকি হৈমরও তাই ইচ্ছে ছিল। সাধারণ ভাবে এখানে দেখলে হয়তো মনে হতেই পারে যে পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক। সব ধোঁয়াশা মিটে যায় হৈম যখন বলে –

> “জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।”[৮]

এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় প্রয়োজনটা কারো ব্যক্তিগত নয় তাঁদের সংসারের ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু চাইলেই কি আর সবকিছু পাওয়া যায়, এদিকে হৈমর সুস্থ সন্তান জন্মালেও আগের অসুখে আক্রান্ত জমিদারের সন্তানটি। ডাক্তারের নির্ণয় দ্বারা জানা যায়, শ্যামাদাস বাবুর যৌবনে কোন ব্যভিচারের কারণে তার সন্তানদের এই অকাল মৃত্যুর কারণ। মৃত্যু মুখে পতিত জমিদারের সন্তানের সঙ্গে নিজের সদ্যজাত সন্তানের অদল-বদল ঘটিয়ে পূর্ণ সিংহবাহিনীর প্রসাদ ও দশ বিঘা জমির ব্যবস্থা করে নেয়। এখানে শুধুমাত্র জমির জন্য পুত্র বদলানো ভাবলে তা ভুল হবে। দরিদ্র অলস ব্রাহ্মণের এমনিতেই দূর্গতির শেষ নেই যেখানে নিজের ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া, রোগে ঔষুধ, গায়ে জামাকাপড় কিনে দেবার পয়সা নেই সেখানে যদি আরো নতুন কেউ পদার্পন করে তাহলে অসুবিধে আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। তাই নিজের সংসারের জন্য দশ বিঘা জমি এবং সিংবাহিনীর প্রসাদ যেমন জরুরী তেমনি নবজাতকটির ভবিষ্যতের জন্য নিজের সন্তানকে অন্যের পরিচয়ে বড়ো হতে দেওয়াটাও একান্তি জরুরী হয়ে পড়েছে। শুধু মাত্র সন্তানদের জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত থাকলে তো হয় না, তাকে সঠিক ভাবে মানুষ করতে হয়। না হলে পূর্ণর বড়ো ছেলেটি মিষ্টি খেতে না পেয়ে যেমন নিজের মাকে মারতেও দ্বিধাবোধ করেনি ঠিক একি শিক্ষা সদ্যজাত শিশুটিও পাবে এই আশঙ্কায় হয়তো চক্রবর্তী এমন অস্বাভাবিক কাজ করে বসে।

পরবর্তীতে দেখা যায় হৈম ছেলেগুলিকে স্কুলে দিয়েছে। বড় ছেলে এখন আর ইতরের মতো কথা বলে না। আত্মসম্মানবোধ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে, তাই তার বড় ছেলে বলে বসে –

> “বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা। ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে ভাঁড়ের বেটা খুরি। তুমি বাপু বারণ করে দিও বাবাকে।”[৯]

এখানে স্পষ্টতই বোঝা যায় পূর্ণ সমাজের চোখে নিজে পতিত হয়েও পরিবারের কথা ভেবেছে। গল্পটি ক্রমশ যত পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। প্রথমে জাত খুইয়ে অগ্রদানী হয়ে শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রীর পিন্ড তার নিজ পুত্রের হাতে খায়। গল্পের শেষে আবার নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস যেখানে নিজের ছেলের পিন্ড পুত্রবধূর হাতে খেতে হয় পূর্ণকে। পূর্ণ চক্রবর্তী শুধু যদি অমানবিক বা লোভী হতো তবে গল্পের শেষে নিজের পুত্রের পিন্ড খেতে দ্বিধাবোধ করতো না। কিন্তু এখানে দেখা যায় চক্রবর্তী জমিদার বাবুর পা ধরে বলছে –

> “পারব না বাবু, আমি পারব না।”[১০]

কিন্তু নিয়তির করাল গ্রাস থেকে রেহাই কোথায়? তাই বাধ্য হয়ে নিজের পুত্রের পিণ্ড খেতে হয় চক্রবর্তীকে। আর এখানেই গল্পটি ট্র্যাজেডির রূপ ধারণ করে।

‘বেদেনী’ গল্পটিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমত, রাধিকা উন্মত্তযৌবনা এক নারী। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী –

> “কালো সর্পিনীর মতো ক্ষীনতনু, দীর্ঘাঙ্গিনী বেদিনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা...মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনি চোখে ধরা দেয় একটা নেশা।”[১১]

এই নেশা ধরানো অবয়বকে এক জায়গায় ধরে রাখা খুবই কঠিন, আলোচ্য গল্পে সেটাই তো হয়েছিল। প্রথমে রাধিকার সঙ্গে বিবাহ হয় নিরুত্তেজ, পৌরুষহীন শিবপদর সঙ্গে, সে রাধিকার ক্রীতদাস ছিল। গ্রামের সকল মানুষের কাছে তার ছিল সম্মান, সে রাধিকাকে সুখেই রেখেছিল কিন্তু আরামে রাখতে পারেনি। রাধিকার দুর্বার কামতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। রাধিকা তাই শিবপদকে ছেড়ে শম্ভু বাজীকরের কাছে আশ্রয় নেয়। শম্ভুর শাহস এবং বাঘের সাথে লড়াকু খেলা দেখে রাধিকা বিস্মৃত হয়ে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে শম্ভুর তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়। পাঁচ বছর এভাবে শম্ভুর সাথে কাটানোর পর রাধিকার কোথাও যেন মনে হয়েছে, শম্ভুর পোষ্য বাঘের মতো শম্ভুরও সেই তেজ আর নেই, তাই হয়তো শেষমেশ কিষ্টোর হাত ধরেই পালিয়েছে। অতএব এখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে মিশেল ফুকো কথিত 'discipline and punishment' এর জায়গাটা রাধিকা যেন বারবার ভেঙে দিচ্ছে। সমাজে যেভাবে নারীদের অবস্থানটিকে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখা হয় এবং সেই শৃঙ্খলার বাইরে গেলে তার জন্য যেমন শাস্তি বরাদ্দ থাকে সেই চিরাচরিত প্রথাকে রাধিকা ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে। রাধিকার বারবার সঙ্গী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেমন তার যৌন চাহিদার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই রাধিকা আবার ক্ষমতাকেও ভালোবাসে, এ কারনেই হইতো সে শিবপদ–শম্ভু–কিষ্টো এ ভাবেই পর্যায়ক্রমে সঙ্গী পরিবর্তন করে গেছে।

দ্বিতীয়ত, গল্পের চরিত্রগুলির নামকরণ বিশ্লেষণ করলে এক অন্য তথ্য চোখে পড়ে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধিকা, আর এই চরিত্রটিকে যদি রাধা ভেবে আলোচনা করা যায় তাহলে গল্পের মোড় অদ্ভূত ভাবে পালটে যাবে। রাধিকার প্রথম বিবাহ হয় নিরুত্তেজ শিবপদের সঙ্গে। আর এই শিবপদর সঙ্গে আইহন ঘোষের অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। এই শিবপদর সমাজে অনেক সম্মান থাকলেও, রাধিকার কাছে সে ক্রীতদাস হয়েই ছিল। তবুও রাধিকা তার সাথে থাকতে পারেনি। কারণ রাধিকার (রাধা) টান যে শুধু কৃষ্ণের প্রতি, সে কেন ঘর করবে শিবপদর (আইহন ঘোষ) সঙ্গে। কৃষ্ণ খুঁজতে বেরিয়ে রাধিকা শম্ভুর দর্শন পায়, আর এই শম্ভুকে যদি শিব ভেবে তুলনা করি তাহলে অনেকাংশে সেখানেও মিল পাওয়া যায়। শম্ভুর শক্তি, সাহস দুই থাকলেও বয়সে ছিল বুড়ো, তাই সেখানেও রাধিকা বেশি দিন টিকতে পারে নি। আসলে রাধা কি আর কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারো সাথে থাকতে পারে? তাই সে তো নিজের কাঙ্খিত মানুষকে খুঁজবেই। এমন পর্যায়ে গল্পে তৃতীয় ব্যক্তি কিষ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তের বর্ণনাটি একটু তুলে ধরলেই বিষয়টি বোঝা সহজ হয় –

> "নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।
> কেনে?
> নাম বটে, কিষ্টো বেদে।
> তা গালি দিব কেনে?
> তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।"[১২]

আর এখান থেকেই গল্পের তাৎপর্যটাই পালটে যায়। কিষ্টোর প্রতি শম্ভুর হিংসার কারণে গোপনে কিষ্টোর তাঁবুতে পুলিশ ডাকলেও সেখান থেকে রাধিকাই কিষ্টোকে উদ্ধার করে, নানা ছলা-বলা-কৌশলে। এখানে কিষ্টোর প্রতি রাধিকার একটা টান অনুভব করা যায়। আর টান থাকবেই না কেন –

> "রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান।
> দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।।"[১৩]

কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকাকে তো মিলিত হতেই হবে তাতে যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন। শেষ পর্যন্ত গল্পেও তাই হয়ে ছিল, তাই এখানে বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদটির গুরুত্ব রয়েছে –

> "কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
> আনল ভেজাই ঘরে।।"[১৪]

সত্যি, রাধিকা এখানেও শম্ভুর তাঁবুতে অর্থাৎ নিজের স্বামীঘরে আগুন লাগাতে পিছুপা হয় না এবং সমস্ত কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে কিষ্টোর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আলোচ্য 'তারিণী মাঝি' এবং 'নারী ও নাগিনী' গল্পদ্বয়ে একটি ত্রিকোন প্রেমের ছবি পাওয়া যায়। গল্প দুটির মধ্যে তৃতীয় চরিত্র ময়ূরাক্ষী (নদী) এবং উদয়নাগ (নাগিনী) এরা কেউই মনুষ্য নয় তবুও লেখকের কলমের আঁচড়ে এরা মনুষ্য আচরণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষে মৃত্যু দুটির কারণও এক প্রকার নারী মনস্তত্ত্বের হিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তী 'অগ্রদানী' গল্পটির মূল বিষয় শুধু মাত্র চক্রবর্তীর লোভ এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবনাকে দেখানই হয় নি, চক্রবর্তীর এই লোভের অন্তরালে রয়েছে তার দুঃস্থ পরিবারটির জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নিরাপত্তার কথাও ভেবেছে। আলোচনার শেষে 'বেদেনী' গল্পে পাওয়া যায় রাধিকার (রাধা) কিষ্টোর (কৃষ্ণ) সাথে মিলনের এক অদ্ভুত তাৎপর্যময় বর্ণনা।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ. ৩৫
২. ভট্টাচার্য জগদীশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২৫তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৫, পৃ. ৩৬
৩. ঐ, পৃ. ৩৯
৪. ঐ, পৃ. ৩৬
৫. ঐ, পৃ. ৪১
৬. ঐ, পৃ. ৫৯
৭. ঐ, পৃ. ৬৩
৮. ঐ, পৃ. ৮৭
৯. ঐ, পৃ. ৯২
১০. ঐ, পৃ. ৯৩
১১. ঐ, পৃ. ৯৫
১২. ঐ, পৃ. ৯৬
১৩. চট্টোপাধ্যায়, ড.অশোক, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রথম প্রকাশঃ শুভ রথযাত্রা, ১৪১৯, পৃ. ২২
১৪. ঐ, পৃ. ১৮৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, মে, ২০১৫
২. দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, সপ্তম মুদ্রণ, মে, ২০১৩
৩. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, গল্পচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮
৪. ব্যানার্জী অরীন্দ্রজিৎ (স্মপা.), দাম্পত্য অভিঘাত ও অভিপ্রায়, সোপান,২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯